ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 548-555
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.042

আধুনিক সংস্কৃত নাটকে অন্ত্যজ জীবন

এস কে মইনুদ্দিন, *সিধো কানহো বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.01.2025; Accepted: 24.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper explores the depiction of the "depressed classes" in modern Sanskrit dramas. The discussion begins with references from the Ramayana, Mahabharata, Smritishastra, and Dharmashastra, which describe these communities as the lowest caste, born from the bodies of deities of the three main castes. The term Antyaja refers to individuals considered lowly, despicable, and untouchable. Their dwelling places are depicted as being far from civilized society—at the foot of mountains, in slums, and in dusty, remote areas—symbolizing their marginalized status. However, the meaning of "depressed class" was not always devoid of dignity.

Several renowned playwrights in modern Sanskrit drama, such as Shrijiva Nyaytirtha, Nityananda Smrititirtha, Haridas Siddhantabagis, S.B. Belankar, Ram Kishore Mishra, and Motinath Mishra, have portrayed these marginalized groups in their works. Notable dramas include Daridradurdoibom, Chipitak-Carvanam, Mashakdhani, and Valmikitalavam, among others. These plays feature characters from the Antyaja or depressed classes, such as Bakreswar, Mandodari, Lombodar, and Kapali.

The plays highlight the exploitation and oppression of these characters by the capitalist elite. Through them, society's most devious and immoral actions are carried out, reinforcing their position as outcasts. In essence, these dramas critique the systemic marginalization of lower-class communities and expose the socio-economic structures that have left them behind.

Keywords: Antyaja, caste system, socialism, economic hardship, housing, capitalism.

আধুনিক সংস্কৃত নাটকে অন্ত্যজ'দের জীবন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রাচীন সাহিত্যে অন্ত্যজ জীবন সম্পর্কে কী আলোচনা করা হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের একটি মাত্র সূক্ত পুরুষসূক্ত, সেখানে এই শূদ্রদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে বিরাট পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ থেকে শূদ্রদের সৃষ্টি। সূক্তটি নিম্নরূপ –

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।"[১]

আবার মনুস্মৃতিতে জাতি ভেদ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে –

"লোকানাস্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখ বাহূরূপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্যয়ৎ।।"[২]

মহাভারতেও এই জাতি বা বর্ণ সৃষ্টির সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে –

"পুরূরবা উবাচ। কুতশ্চিৎ ব্রাহ্মণো জাতো, বর্ণাশ্চাপি কুতস্ত্রয়ঃ। কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠ স্তন্মে ব্যাখ্যাত মর্হসি। মাতরিশ্বোবাচ। ব্রাহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রহ্মণো রাজসত্তম্। বাহূভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরূভ্যাং বৈশ্য এব চ। বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়ানাং ভরতর্ষভ বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো বিনির্মিতঃ।।"[৩]

অর্থাৎ পুরূরবা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্রাহ্মণ কোথা হইতে সৃষ্টি হল বা অন্য তিনটি বর্ণই বা কীভাবে সৃষ্টি হল। এর উত্তরে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের মুখ থেকে, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং ব্রহ্মার পাদদ্বয় থেকে শূদ্র জাতির আবির্ভাব।

আবার মহাভারতের শান্তি পর্বেও বলা হয়েছে –

"ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভিঃ বর্ণতাং গতম্।।"[৪]

অর্থাৎ জগতে বর্ণ, জাতি বলে বিশেষ কিছু নেই, সমস্ত জগতে একটি মাত্রই ব্রহ্ম কর্তৃক ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হয়েছিল, তারপর কর্মের উপর ভিত্তি করে বর্ণের বিভাজন করা হয়েছিল।

অতএব বর্তমানে 'অন্ত্যজ' শব্দের যে সাধারণতঃ অর্থ দাঁড়ায় তা হল অধম নীচাশয় অস্পৃশ্য ব্যক্তি অন্ত্যজ নামে পরিচিত। যে সমস্ত জাতি বেদের নিয়ম পালন করেন না, যাদের উচ্চতর সংস্কৃতি বলতে কিছুই নেই। যেমন – কোল, কিরাত, কুরকু, শবর, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি এবং বৈদিক সময়কালের দস্যু, ব্রাত্য এবং নিষাদদেরও সমাজে 'অন্ত্যজ' বা শূদ্র জাতি মনে করেন। সমাজে অন্ত্যজ বা নিম্নবর্গের মানুষ বলতে বোঝায় শূদ্র জাতিকে। শূদ্র বলতে বোঝায যারা সমাজে পিছিয়ে পড়া এক ধরনের শ্রেণী, বর্তমানে যাদের আদিবাসী বা দলিত বলে চিহ্নিত করা হয়। এই আদিবাসীদের ইংরাজী প্রতিশব্দ হল 'tribe'। অনেক বিদ্বান আবার এদের হিন্দু বলে স্বীকার করেননি। আদিবাসীদের ধর্ম আলাদা। তাদের সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। আদিবাসীদের ধর্ম ইংরাজীতে 'Animism' সর্বপ্রাণাবাদ, আর হিন্দুদের ধর্ম 'Hinduism' হিন্দুধর্ম। দুটিই পৃথক ধর্ম। "এই বাংলায় যখন হিন্দু , বৌদ্ধ, মুসলমান কেউ ছিল না, তখন বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষেরা দ্রাবিড়, নিষাদ আর কিরাতের আদিম ধর্ম পালন করত।"[৫] আবার অন্নদাশংকর আদিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন – "ভারত আর হিন্দু সমার্থক নয়, ভারত হিন্দুর চেয়ে বড়ো, হিন্দুর চেয়ে পুরাতন, আর্যের চেয়েও প্রাচীন, বেদের চেয়েও আগেরকার। অগ্রাধিকার কারো যদি থাকে তা আদিবাসীদের। তারাই এদেশের বড় ইণ্ডিয়ান। তারাই আদি ভারতীয়।"[৬] এই আদিম মানুষরাই ভারতের মূল সম্পদ বা মূল ভারতীয়।

কিন্তু গবেষণা পত্রের সুবিধার্থে অন্তর্নির্হিত ভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় লেখকের লেখনীতে, সরকারি কাগজে তারা আদি ভারতীয় হলেও বর্তমান সমাজে তাদের অবস্থান খুব একটা শোচনীয় নয়। সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা প্রতিদিন তাদের উপর নানান রকম অত্যাচার করে চলেছে।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যে 'অন্ত্যজ' শ্রেণী বিষয়টি নির্বাচন করার পূর্বে প্রাচীন বা আদি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন কালিদাস রচিত নাটক 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' থেকে ধীবরের বৃত্তান্ত, শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম্' থেকে চেট ও বিটের বর্ণনা অন্ত্যজ বা সমাজে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদেরই বোঝানো হয়েছে।

এই অন্ত্যজ বিষয়ে অনেক আধুনিক পণ্ডিত আলোচনা করেছেন যেমন - পঞ্চানন তর্করত্ন , চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, কালীপদ তর্কাচার্য, রমা চৌধুরী, তারাপদ ভট্টাচার্য, এস.বি. বেলঙ্কর, রাম কিশোর মিশ্র, মতিনাথ মিশ্রা, রাধাবল্লভ ত্রিপাঠী প্রমুখ। আমি তাঁদের রচিত নাটক নিয়ে গবেষণা পত্রটিতে আলোচনা করেছি। এই 'অন্ত্যজদের' নিয়ে আধুনিক সংস্কৃত বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ কতটুকু আলোচনা করেছেন সেই বিষয়টি পত্রিকার মূল আলোচ্য বিষয়।

এখানে যে শব্দটি রয়েছে নিম্ন বর্গের মানুষ বা পিছিয়ে পড়া বলতে এক কথায় বোঝায় 'অন্ত্যজ'। কিন্তু সাধারণভাবে এর অর্থ যদি করা হয় ,তা হল সমাজের নিম্ন স্তরের, অস্পৃশ্য, অবজ্ঞাত। মূলতঃ এক কথায় যদি এর অর্থ করা হয়, তা হল দরিদ্র। সবার পিছে সবার নিচে এদেরকেই বোঝানো হয়। কিন্তু এই 'অন্ত্যজ' শব্দের অর্থ আগে গরিমাহীন ছিল না।

পরবর্তী সময়ে তার অর্থকে সংকীর্ণ ব্যঞ্জনায় পর্যবেশিত করা হয়েছে। অর্থগতভাবে এর অর্থ দাঁড়ায় অন্ত্য = অন্ত+জ= জন্মা (যে জন্মে)। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ বিরাট পুরুষের দেহ থেকে জন্মানোর পর শেষ জাত বলা হয় এদের। চতুর্থ বর্ণ হল শূদ্র। এই শূদ্রদের বলা হয় পিছিয়ে পড়া বা অন্ত্যজ। এই শূদ্র অর্থে কোনো ঘৃণা নেই। কারণ পবিত্র বিরাট পুরুষের অঙ্গ থেকেই এরা জাত। সুতরাং সকল বর্ণই পবিত্র। সমস্যা সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে। শূদ্রদের ঔরসে উচ্চবর্ণের রমণীর গর্ভে প্রতিলোমজ সন্তানদের বলা হতে লাগল নিম্ন বর্গের মানুষ। আর তখন থেকেই এদের প্রতি সমাজের অন্য তিন বর্ণের অবজ্ঞা তৈরী হল। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে সমাজের চিত্রগুলি তুলে ধরেছেন যথা - চৌরচাতুরীয়ম্, নষ্টহাসম্, সাম্যসাগর-কল্লোলম্ ,ভারতলক্ষ্মী, অথ কিম্, ননাবিতাড়নম্, মাতৃহননম্, মশকধানী,গণেশপূজনম্, সোমপ্রভম্, কুর্যাৎ সদা মঙ্গলম্ প্রভৃতি। এই সব নাটক গুলিতে যেসব চরিত্রের বর্ণনা করেছেন সেই সব চরিত্রগুলিকে দেখে মনে হয় এরা সমাজে পিছিয়ে পড়ার জন্য তাঁদের এই করুণ অবস্থা, অবহেলিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে হয়। তাই শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয় বলেছেন "মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে"[৭]। অর্থাৎ এই সব কথার দ্বারা কবিরা বলতে চেয়েছেন, তোমরা শোষিত হইওনা, কেনো সমাজ তোমাদের বঞ্চিত করলেও সততার পথে থাকলে জয় অবশ্যম্ভাবী। এই ভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে নানান রকম উপদেশ গ্রন্থকাররা দিয়েছেন। যেমন একটি গ্রন্থ হল - সাম্যসাগর-কল্লোলম্। এখানে তিনি আমাদের একটি শিক্ষা দিয়েছেন, তা হল সকল জীবকে যে সমান দৃষ্টিতে দেখে, সেই প্রকৃত সাম্যবাদী। সাম্যবাদী হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো মর্যাদার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ সমাজে ধনবাদীরা যে শুধু ধনীদেরই সম্মানের চোখে দেখবে তা নয়। তারা তাদের মনুষ্যত্ত্বের বিচারে সমাজের পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের বা অন্ত্যজদের সমান চোখে দেখবে। এই কথাটি যেন বারবার গ্রন্থকারিকরা তাঁদের রচনার মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন। শ্রীজীব ন্যয়তীর্থের দরিদ্রদুর্দৈবমে পাওয়া যায় -

"নান্যৎ কিমপি! কিম্ অহং হতভাগ্যং করোমি?
দ্বারি দ্বারি নিবারিতোঽপি বিচরন্ হা! সারমেয় যথা

দণ্ডং কুত্র চ তণ্ডুলং কিল লভে মুষ্ঠ্যা মিতং কষ্টতং।
প্রত্যাখ্যানপরং গৃহস্থনিকরং দুঃশ্রব্যশাপাক্ষরৈঃ।
রুক্ষৈর্বুক্করবৈঃ করোমি বিধুরং ত্বাস্ফালনং নিষ্ফলম্"[৮]।

এখানে এক হতদরিদ্রের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, সে এক মুঠো ভাতের জ্বালায় দুয়ারে দুয়ারে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে, গালি শুনতে হয়েছে ইত্যাদি। এই অবহেলিত অথচ অমূল্য সম্পদের দিকটি সাহিত্যের গবেষকদের দ্বারা বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়নি। অন্ত্যজদের বাসস্থান সম্পর্কে যদি বলা হয় তা হলে বলা যায় সভ্য সমাজ থেকে দূরে অর্থাৎ বন, জঙ্গল, শশ্মান, পাহাড় পর্বতের পাদদেশে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাদহীন, ধূলোবালি মিশ্রিত পরিবেশে বেড়ে ওঠা এই অন্ত্যজ বা সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের। এদের বাসস্থান, সংস্কার ইত্যাদি দেখে তাদের আদিবাসী নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাই তাদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে - "the most exploited section of the pluralist Indian society"[৯] অর্থাৎ তাঁরা বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজ কাঠামোর সবচেয়ে শোষিত জনগোষ্ঠী। রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ যারা তাদের অর্থাৎ শূদ্রদের যে আদি বাসস্থান তা থেকে অন্যত্র সরিয়ে যেমন -বনজঙ্গল, পাহাড়, পর্বত অধিগ্রহণ করে চাকরি দেওয়ার নাম করে জমিগুলি অধিকার করে নিচ্ছে।

সামাজিক প্রেক্ষিতে আলোচনা করে দেখা গেছে যে সমাজের 'অন্ত্যজ' শ্রেণীর মানুষরা কুসংস্কার বাঁধনে বেশি আগ্রহী। অনেক সময় গাছ, নদী, পাহাড়-পর্বতকে দেবী-দেবতা মনে করে পূজো করেন।

আধুনিক নাটকগুলিতে সাম্যবাদ কী সে বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। ন্যায়তীর্থের সাম্যসাগর-কল্লোলম্ নাটকে সাম্যবাদ সম্পর্কে বলতে দেখা গেছে। সূত্রধার যখন বিদূষককে জিজ্ঞাসা করেছেন যে সাম্যবাদী কাকে বলে, তখন বিদূষক এক কথায় সুন্দর ভাবে এর উত্তর দিয়েছেন যে সকল জীবকে যে সমান দৃষ্টিতে দেখে, সেই প্রকৃত সাম্যবাদী। সাম্যবাদী হওয়ার জন্য বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতের সম্পর্ক হওয়ার প্রয়োজন নেই।

সাম্যবাদী কী? সাম্যবাদ বা Communism (ইংরেজি শব্দ), Communis (লাতিন শব্দ) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ সাধারণত চিরন্তন হল শ্রেণীহীণ, শোষণহীণ, ব্যক্তি মালিকানাহীণ এমন একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শ বা ধর্ম যেখানে ব্যক্তিগত মালিকাণার স্থলে উৎপাদনের সকল মাধ্যম এবং প্রাকৃত সম্পদ (ভূমি, খনি, কারখানা) রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। সাম্যবাদ হল সমাজতন্ত্রের একটি উন্নত এবং অগ্রসর রূপ, তবে এই বিষয়ে অনেক মতপার্থক্য আছে। উভয়েরই মূল লক্ষ্য হল ব্যক্তিমালিকানা এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপর শোষনের হাতিয়ার পূঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার অবসান ঘটানো। কোন দেশে সাম্যবাদ থাকলে সেখানে ধনী গরিবের ব্যাবধান থাকবে না। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকার নেবে। সাম্যবাদ হল স্বাধীন, সামাজিক ভাবে সচেতন শ্রমজীবী মানুষের উচু মাত্রায় সুসংগঠিত সমাজ, তাতে কায়েম হবে সকলের স্বশাসণ। সেই সমাজ সমাজের কল্যাণের জন্য শ্রম হয়ে উঠবে প্রত্যেকের মুখ্য অপরিহার্য প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন উপলব্ধি করবে প্রত্যেকেই। প্রত্যেকের সামর্থ্য নিয়োজিত হবে সর্বসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য। সাম্যবাদ ব্যক্তিকে ব্যাপক সামাজিক স্বাধীনতা দেয়। এছাড়াও সাম্যবাদের অর্ন্তগত অনেক কিছুই আছে, সাম্যবাদ হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণীর একটা পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শে ব্যবস্থা এবং একই সময়ে একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা।

অন্ত্যজদের দিশা ও দশার বর্ণনা করতে গিয়ে অন্ত্যজ বা সমাজে পিছিয়ে পড়ার মুখ্য যে কারণ সেটি হল অর্থনৈতিক অবস্থা। এই অর্থের অভাবে তাদের স্বপ্ন গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটি লোকগান আছে যা হল নিম্নরূপ –

"মুলুকে নাহি মিলে কাম
কৈসে বাঁচে প্রাণ? সাঁঝে খালে বিহানে হয় টান।
পরের ঘর পর খাটালী সকাল হলেই যায় বাগালীরে
খ্যাটে খ্যাটে পিঁঠে বহে ঘাম
কৈসে বাঁচে প্রাণ?
নওয়াগড়ের কুটুম অ্যাল
খাওয়া – দ্যাওয়া স্যারে গেল
মাড়ভাতে রাখলই মান
কৈসে বাঁচে প্রাণ।।"[১০]

অন্ত্যজদের দুর্দশার দিকটি পরিস্ফুটিত করার জন্য আধুনিক নাটকগুলি থেকে কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের নাটক দরিদ্রদুর্দৈবম্ থেকে বক্রেশ্বর, মন্দোদরী ও তাঁর দুই পুত্রের বর্ণনা। নাটকটিতে দেখা গেছে –

'কুটিরসম্মুখস্য গ্রাম্যপথ।
ততঃ প্রবিশতি স্কন্ধে ভিক্ষাপাত্র্য বহন যথোক্তো বক্রেশ্বরশর্মা।'[১১]

অতঃপর দেখা গেছে সে বলেছে দারে দারে ঘুরে আমার মতো দারিদ্রের শুধুমাত্র দুর্দশাই আছে। শহরের যে সব ধনী ব্যক্তি রয়েছে তাদের কাছে ভিক্ষে চেয়েও আশানুরূপ ভিক্ষা অর্জন করতে পারিনি। সেই সব সমাজের উচ্চবিত্তদের ধিক্কার জানাই। হরে রাম্।

এই রূপ অনেক দুর্দশার বৃত্তান্ত বক্রেশ্বরের জীবনে নাট্যকার নাটকের মধ্যে দেখিয়েছেন। যেমন - নিজের ভিক্ষালব্ধ চাল নিজে খাওয়ার জন্য লুকিয়ে রেখেছেন, নিজের স্ত্রী পুত্রদের না দিয়ে। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় সে অন্ত্যজ নিপীড়িত একজন দারিদ্র ব্যক্তি।

'হরে রাম'। (ইতি কচ্ছবস্ত্রম্ আকৃষ্য তন্ডুলান্ বধ্নাতি) মন্যে গৃহিণী তনয়ৌ চ কুটিরাদ্ বহিরেব মমাগমানং প্রতীক্ষ্যমাণাস্তিষ্ঠন্তি। যাবৎ পশ্যামি তেষাম্ আচরণম্।'[১২] দ্বিয়ীয়ত বক্রেশ্বরের স্ত্রী মন্দোদরী নাটকে প্রবেশ করে, দেখা গেছে সে প্রবেশ করেই নিজের দুই পুত্রকে অভাবের তাড়নায় দুই কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন – 'আ হতভাগ্যৌ'! 'কুক্কুরশাবকোবিব কথং মিথঃ যুধ্যতাম।'[১৩] অতঃপর দেখা গেছে বক্রেশ্বরকে সে গোষ্ঠীপালক বলে সম্বোধন করলেও বক্রেশ্বরের কিন্তু কোন রূপ চিন্তা নেই পরিবার পরিচালনা করার।

সে নিজের পুত্রদের খাদ্যের জোগান না জিতে পারলেও শাসন করার ক্ষেত্রে সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তাই সে নিজের পুত্রদের গর্দভীর বাচ্চা বলে সম্বোধন করেছেন। '(সহসোপসৃত্য) আঃ গর্দভীতনয়ৌ তিষ্ঠতং যাবৎ এতেন ছত্রদণ্ডেন যুবয়োঃ শাসনং করোমি।'[১৪]

কিন্তু দেখা গেছে মন্দোদরী খিদের জ্বালায় ব্যাকুল। তাই বক্রেশ্বরকে কিছুটা ব্যঙ্গ করেই বলেছে যে তুমি তো অনেক খাবার আমাদের দিয়ে গিয়েছিলে। আমরা সেগুলি খেয়ে পেট ভর্তি করে বসে আছি। পুত্র লম্বোদর কিছু আম পাতা খেয়ে বসে আছে। তোমার জন্য কিছু রেখে দিয়েছে।

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ রচিত অন্য একটি নাটক হল 'চিপিটক-চর্বণম্' সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজে যে প্রচলিত নিয়ম কানুনের রূপ পরিবর্তন হয়েছে তা দেখিয়েছেন, দেখানো হয়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের নিয়ম পরিবর্তন হয়েছে, মানুষ এখন খুব ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা আত্মকেন্দ্রিক নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা তাকে তার মমত্ববোধ, ভালোবাসা থেকে কত সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।। রূপকটিতে কয়েকটি চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা - কপালী, রঙ্গিণী, মন্থরা, ভৃত্য, পঙ্গু প্রমুখ। এদের কথোপকোথন এবং জীবনযাপনের কাহিনী রূপকটিকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছে।

প্রথমত 'কপালী' নামক চরিত্রটি ধনী হওয়ার পরেও সে কিন্তু ধনলোভী, তার মানসিক চিন্তাধারা নিকৃষ্ট মানের। সে একটা ছেঁড়া ছাতা, ছেঁড়া জুতোর জন্য নিজের স্ত্রী-ভৃত্যদের গালিগালাজ করেছেন। ভৃত্যদের লাঠি নিয়ে মারার জন্য উদ্যত হয়েছেন। তাই কপালীকে বলতে শোনা গেছে -'অরে সর্বস্বনাশিনি! পতিদ্বেষিণি ! বাচং সংযচ্ছ নোচেত্তব কণ্ঠরোধং করিষ্যামি্। (ইতি হস্তমুদ্রাং প্রদর্শ্য রঙ্গিণীং প্রতি ধাবতি।)'[১৫]

দ্বিতীয়ত 'রঙ্গিণী' তার কথাবার্তাতে বোঝা গেছে যে তার স্বামী ধনী হলেও মানসিক দিক থেকে নিকৃষ্ট। সংসার পরিচালনায় তার সহধর্মিনীকে অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় নারীকে তিনি সবসময় পিছিয়ে রাখতে চান। তাই রঙ্গিণী বলেছেন - আমি সধবা থেকেই আমি কোন স্বর্গে বাস করছি। এই কথার দ্বারাই অনুমান করা যায় যে সে নিজের সহধর্মিণীকে দুঃখ কষ্ট দেন। তাই রঙ্গিণী বলেছেন - 'জানামি বিধবা স্যামিতি। সধবাপি কিমধুনা স্বর্গে বসামি, বিধবা ভূত্বা কিং পাতালং যাস্যামি?'[১৬]

তৃতীয়ত মন্থরা, পঙ্গু প্রভৃতি ভৃত্যদের উপর কপালী নানান রকম অত্যাচার, গালিগালাজ করার পরেও তার কাছে কাজের জন্য রয়ে গেছে। কোন সময়ে তারা প্রাণভয়ে লুকোছে কখনও আবার কপালীকে বাবু বলে সম্বোধন করেছে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে তারা সমাজে খুব পিছিয়ে থাকার জন্য বা অর্থাভাবের জন্য অত্যাচারিত শোষিত হওয়ার পরেও দু-মুঠো খাবার আশায় তার কাছেই থেকে গেছে। শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের এই রূপকটি অবশ্যই মন্থরা, পঙ্গুরাম্ প্রমুখ চরিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে সমাজে বেঁচে থাকার জন্য সাহেবদের কাছে অত্যাচারিত, অপমানিত, শোষিত হয়েও সংগ্রাম মুখর হয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

এইরূপ অন্য একটি নাটক হল রাধবল্লভ ত্রিপাঠী দ্বারা রচিত 'মশকধানী'। মশকধানী নামক গ্রন্থটির সাধারণতঃ অর্থ করলে দাঁড়ায় মশারি অর্থাৎ যেখানে সমাজের উচ্চপ্রতিষ্ঠিত ধনীদের আশ্রয়ের স্থান যেখানে অন্ত্যজদের কোন স্থান নেয়। এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে সমাজের পূঁজীবাদীরা অন্ত্যজ অর্থাৎ গরিবদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে চলেছে। নাটকটিতে একজনকে বলতে শোনা গেছে যে কোন এক ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয় তাই যেন তার ওপর রাগ বা অত্যাচার যেন না করা হয়। কারণ তার অনুরোধে শ্রেষ্ঠী নামক একজনের চাকর চাকরিটা পেয়েছে।

অপর অন্য একজন নাট্যকার হলেন নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়। তাঁর নাটকগুলিতেও সমাজে অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিতদের অনেক লেখালেখি আছে। তার রচিত নাটকের মধ্যে কয়েকটি নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনা করা হল। যেমন - নাট্যকার দ্বারা রচিত 'বাল্মীকিত্বলাভম্' নাটকে কয়েকটি চরিত্রের

উল্লেখ রয়েছে যেমন – পারিপার্শিক, সূত্রধার এবং রত্নাকর প্রমূখ। তাদের মধ্যে রত্নাকরের ভূমিকা নাটকটিতে অপরিহার্য। 'রত্নাকর' সমাজের করুণ অবস্থার দিকটি তুলে ধরেছেন। সে সমাজের উচ্চশ্রেণীর কাছে বা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেছেন। হে মহারাজ! আপনি সমাজের এই দৃশ্যগুলি কি দেখতে পারছেন না। চারিদিকে সকলেই খাদ্যের অভাবে রয়েছে। অন্নের অভাবে প্রতিটি গৃহে তারা ভিক্ষা করে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি করতে গেলে সমাজের কাছে এই অসহায় মানুষদের তিরস্কৃত হতে হয়। এই অন্নের অভাবে মাতা পিতা সন্তান সকলেই ক্ষুধার্থ পীড়িত। তাই রত্নাকর প্রথমেই বলেছেন, ধনীদের এই সমাজ কীসের জন্য, যেখানে দরিদ্রদের জন্য অন্ন জোগাড় করতে পারে না। তাই রত্নাকর বললেন –

"ভো ভো অনুচরাঃ! শৃণুত যূয়ম্।
নিহত্য সর্ব্বান্ ধনিনো বলেন
নিপাত্য ভূমৌ ধনলুব্ধকাংস্তান্।"
"মহারাজ! কথং ন পশ্যামঃ
দিশি দিশি সকলাস্তে খাদ্যপানৈর্বিহীনাঃ
ধনচয়রহিতা ভো মানবাঃ সর্ব্বতোঽদ্য।।"
"স্বেষাং পূর্বাবস্থা চিন্তনীয়ৈব।
প্রতিগ্রহং বয়ং যাতা ভিক্ষাহেতোঃ পুরৈব হি।
তিরস্কৃতাঃ সর্বতো হি খাদ্যং নাপ্তং কথঞ্চন।।"[১৭]

আধুনিক সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে আরেকজন হলেন হরিদত্ত শর্মা। তার রচিত অন্যতম একটি নাটক হল – 'বধূদহনম্'। নাটকটিতে পণপ্রথার মতো একটি সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে নাট্যকার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই পণপ্রথার জন্য দেখা গেছে সমাজে কত দরিদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষ নিজেদের মেয়ের বিবাহ সম্পন্ন করতে না পারার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন। তাই এই কুপ্রথা নাট্যকার নিজের চোখে চাক্ষুস করে খুব ব্যথিত হয়েই নাটকটি রচনা করেছিলেন। সেখানে দেখা গেছে প্রমীলা ও নন্দিতা নামের দুই বোনের গল্প। এক বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেও শান্তি নেয়। নন্দিতা অন্য এক ধর্মের ছেলেকে পছন্দ করেন। কিন্তু পাত্রের পিতা কিছুতেই রাজি নেয়, কারণ মেয়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর অন্তর্গত। নাট্যকার এইভাবে সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে সমাজ এখনও অন্ত্যজদের বঞ্চিত করে রেখেছে।

এইরূপ অনেক আধুনিক নাটক আছে যেখানে অন্ত্যজদের জীবন সংগ্রাম সম্পর্কে অনেক বিস্তৃত বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশেষে বলা যায় প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে কালিদাস, শূদ্রক তথা আধুনিক লেখকদের লেখনীতেও অন্ত্যজদের কঠোর জীবন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্ত্যজদের সামাজিক রীতি-নীতি থেকে আরম্ভ করে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সবদিক দিয়েই সমাজ বঞ্চিত করে রেখেছে। এই সুবিশাল নাট্যগ্রন্থের মধ্যে অনেক ঘটনাই হয়ে উঠেছে 'কালের দর্পণ' হিসাবে। সেখানে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবল প্রতিক্রিয়া, ভয়াবহ বেকার সমস্যা, কদর্য প্রবঞ্চনা, সন্ত্রাসবাদ, নকশাল আন্দোলন,উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, বিধবাদের বিপন্নতার করুণ অবস্থা, পরিবেশ দূষণ, মনুষ্যত্বের অবক্ষয়, জাতপাতের সমস্যা, মূল্যবোধের সংকট এছাড়াও আরও অনেক সমস্যা নাটকগুলিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. শাস্ত্রী, শিবনাথ, 'জাতিভেদ', সাধারণ ব্রাহ্মসমাজযন্ত্রে, কলিকাতা, ১২৯১ সাল, পৃ.৪।
২. তদেব, পৃ.৮।
৩. তদেব, মহাভারত / শান্তিপর্ব, পৃ. ৮।
৪. তদেব।
৫. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, 'বাঙালীর সংস্কৃতি' (৪র্থ মুদ্রণ), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, পৃ.২৮।
৬. বন্দোপাধ্যায়, শৈলেশকুমার, 'জিন্না-পাকিস্তান: নতুন ভাবনা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, ভূমিকা।
৭. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা, 'আধুনিক সংস্কৃত কাব্য: বাঙালী মনীষা শতবর্ষের আলোকে' সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০২০, পৃ.২০।
৮. ভট্টাচার্য, পরমেশ ও মাইতি, খোকন (সম্পা.), 'দরিদ্রদুর্দৈবম্', কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২১, পৃ.১০৬।
৯. মণ্ডল, অমল কুমার, 'ভারতীয় আদিবাসী (সমাজ-সংস্কৃতি-সমস্যা-সংগ্রহ-সংকল্প)', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দেশ প্রকাশন, ২০২২, পৃ. ২৬।
১০. তদেব, পৃ.২৯।
১১. ভট্টাচার্য, পরমেশ ও মাইতি, খোকন (সম্পা.), 'দরিদ্রদুর্দৈবম্', কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২১, পৃ.১০৩।
১২. তদেব, পৃ. ১০৪।
১৩. তদেব, পৃ. ১০৫।
১৪. তদেব, পৃ. ১০৫।
১৫. চট্টোপাধ্যায়, ঋতা ও সেন, সৌম্যজিৎ (সম্পা.), 'শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ ও চিপিটক-চর্বণম্' সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৮, পৃ.৬৮।
১৬. তদেব, পৃ.৬৭।
১৭. মুখ্যোপাধ্যায়, নিত্যানন্দ, 'দৃশ্যকাব্যসঙ্কলনম্' প্রথমভাগম্ (শ্রীবাল্মীকিত্বলাভম্), সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পৃ.১১-১২।